ছোট মুখে কবিতার বড় কথা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যে ইংরেজি কথাটার আমরা বাংলা করেছি..আধুনিক.. তার ব্যুৎপত্তিগত মানে হল মোড় ফেরা বা বাঁক নেওয়া। অথচ বাংলা সাহিত্যে আমারা আধুনিক বলতে হাল আমল বুঝে থাকি। শুধু তাই নয়, আরওসংকীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রোত্তরকালের বাংলা সাহিত্যকে ধরা হয়। অবশ্যই সেই ধারা, যারবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতেচায়।

যে কোনো নতুন লেখকের পক্ষেই তাঁর আগেরলেখকদের থেকে নিজেকে আলাদা করাটা একটা বড় কাজ। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাহাল আমলের লেখক, তাঁদের কাছে এ কাজ আরও কঠিন ছিল ; কেননা সেখানে সম্মুখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

সমস্যাটা একটু নজর করে দেখা যাক।
এখানে মূল সম্পর্কটা লেখকে - লেখকে নয় --লেখকে - পাঠকে ।আগে যা হয়ে গেছে,তার কেবল পুনক্তি হল তাতে কখনই পাঠকের আগ্রহ হতে পারে না। য়াস্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যেভাবে পাওয়া যায়, সেই একই জিনিস লোকেআর-কারো কাজ থেকে সেভাবে কেনই বা নিতে যাবে ? পাঠককে দিতে হবে এমননতুন কিছু, যা রবীন্দ্রনাথে নেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কম বয়সেসন্মুখেতে পথ ধি রবীন্দ্র ঠাকুর লিখে মৌচাকে যে ঢিল ছুড়েছিলেন, তারপেছনে ছিল উত্তরসাধকের এগিয়ে যাওয়ার এই বিড়ম্বিত প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা সাহিত্য শেষ হয়ে যাবে--- এভাবেরবীন্দ্রনাথকে যৎপরোনাস্তি ভাবা রবীন্দ্রভক্তির পরাকাষ্ঠা বলে মনেহলেও সেটা প্রকৃতিস্থতার লক্ষণ নয়। আবার এই একইঅপ্রকৃতিস্থতার উল্টোপিঠ হল রবীন্দ্রোত্তরকেই বাংলাসাহিত্যের আরম্ভ বলে ভাবা।

আসলে থামা নয়, চলার দৃষ্টিতে দেখা। ধরা আরছাড়া, হাঁ আর না-- এই দুইকে গতির প্রবাহে এক করে দেখা।
রবীন্দ্রনাথে কী -নেই তা সাব্যস্ত হবেপরবর্তীকালে কী - আছে তাই দিয়ে। দেখতে হবে আগে কী-ছিল আর এখন কী-নেই।
তার মানে, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়তে হলে শুধু অন্ধ জেদেরবশে তা হবে না। নতুনত্ব বলতে বাইরের চটক নয়, ভেতরের বস্তু। এ থেকে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, ভেতরের বস্তুবলতে আমি কেবল বক্তব্যকেই একমাত্র করে দেখছি। শিল্পেবিষয় আর তারআকার কখনই আলাদাভাবে বিচার্য হতেপারে না। জ্ঞানের রাজ্যে বলবার বিষয়কে নানা আকারে ধরে দেওয়া যায় ; কিন্তু শিল্পেরক্ষেত্রে এ দুইয়ের নিত্য সম্পর্ক। কাজেই উপমা সার্থক শিল্পেরক্ষেত্রে অচল।

শিল্পসৃষ্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য মনেরাখা দরকার। জ্ঞানের রাজ্যে একের বক্তব্য তার পরবর্তীর বক্তব্যেঅন্তর্হিত হতে প

ারে। কিন্তু শিল্পে পরেকার সৃষ্টিতে আগেকারসৃষ্টি কখনও নাকচ হয়ে যায় না।

পুরানো পাথরের যুগে কাজের যে ধরন আর আজস্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যুগে কাজের যে ধরন--- তার মধ্যে মূলগত কোনে াপ্রভেদ নেই। কাটা, ঘষা, ছ্যাঁদা করা, পেষাই, পেটাই--- এইচিরন্তন মূলনীতিগুলোই যন্ত্রের মাধ্যমে আজ মিশ্রিত আর বহুগুণিতহয়ে টিকে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই বাইরে কাজের কোনো নতুন ধরন হতেপারে না।

কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। বহিঃপ্রকৃতিঅন্তঃপ্রকৃতিতে যে ছাপ ফেলে, তাই দিয়ে কবিতা তৈরি হয়।কবিতার সৃষ্টি বস্তুতে থ াকাবহির্জগতের বস্তুপুঞ্জের আদল--- তা সে যতই লুকো-ছাপা থাক একেবারে অবিকলনয়। অভিপ্রায়ের ঝোঁক দিয়ে কমানো বাড়ানো থাকে।

নির্বিশেষকে বিশেষ করে মানুষের চোখেকানে স্বচ্ছন্দেফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। উপমা হল কবিতার প্রকরণ। দুটিআপ াত পৃথককে একত্রে এনে অন্তর্বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া।

কোনো কবি, তিনি যেকালেরই হোন, এ থেকে তাঁরঅব্যাহতি নেই।
ছন্দের বেলায়ও তাই। তার যা মূলনীতি. তাকেঅগ্রাহ্য করা যাবে না। ভাষারও যা মূলনীতি, তাকে লঙঘন করা যাবে ন া।
নিয়মগুলো মানুষের বানানো নয়।প্রকৃতির নিয়ম। তার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ শুধুপারে এক নিয়মকে অন্য নিয়ম দিয়ে কাটিয়ে প্রকৃতিকে নিজের বশেআনতে। এর অন্য নাম মানুষের মুক্তি।

তাহলে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আনারকোথায় ক্ষেত্র ? স্থানকালের বাইরে তেমন কোনো ক্ষেত্র থাকতেই প ারে না। নতুনত্বেরউৎস যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে তা মনের ভেতরে নয়-- বাইরে।সমসাময়িক বাস্তবকে প্রতিফলিত করার সার্থক চেষ্টাতেই এইনতুনত্ব আসতে পারে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় সে - নতুনত্ব এসেছে। যাঁরাবাংলা সাহিত্যের দক্ষ সমালোচক, তাঁরাই পারেন এই নতুনত্বকেপাঠকের চোখে ধরিয়ে দিতে। আমার সে যোগ্যতাও নেই এবং আমি সেচেষ্টাও করব না।

শুধু ছাড়া - ছাড়া ভাবে আমার উপলব্ধির কথা সংক্ষেপে বলব।
রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই এই নতুন ধারার সূত্রপাতহয়। এর বীজ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ধারার মধ্যেই ছিল। যাঁরা একে লালনকরেছেন তাঁরা ঘরেবাইরের নানা সূত্র থেকে তাতে সার যোগ করেছেন আরআগাছা সরিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের যে মানসজগত, তাতে প্রথমমহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবী বেশ বড় রকমের আঘাত হেনেছিল। একদিকে যেমন তঁ ারআশাভঙ্গের অনেক কারণ ঘটেছিল, তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরপ্রথম তীর্থক্ষেত্রে আশা করবারও তিনি অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই পর্বের তাঁর অনেক লেখায় এবং আঁকা ছবিতেতার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে।
পুরনো সভ্যতার যেটা ভেঙে পড়ার দিক,রবীন্দ্রোত্তর কবিরা তাকে আরও জোরালো করে তুলে ধরলেন। যতীন্দ্রন াথসেনগুপ্তের যে দুঃখবোধ, তাতে সমসাময়িকের চেতনার চেয়েও একটাদার্শনিক মনোভাব ফুটিয়ে তোলাই ছিলপ্রবল। তাঁর কবিতা সে যুগেরবাস্তবতার চিত্র যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি চিরন্তনের ভাবচিত্র।অবশ্য তাঁর কবিতায় এমন সব কথ া এল যা ফিটফাট ধোপদুরস্ত তোনয়ই, বরং মাঠময়দানের কাদামাখা। ফলে, তার সঙ্গে যুগমনের একটা মিল ছিল।

সুধীন্দ্রনাথেরও ঝোঁকটা ছিল দার্শনিক। কিন্তুসংকটাপন্ন সময়ের চেতনা তাতে স্পষ্ট। আধুনিক জীবনচিত্রে অঙ্গীভূতছিলতঁার দার্শনিকতা । ভাষাকে তিনি কঠিন নৈয়ায়িক শাসনে বেঁধে এবং সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যেরকৌশল প্রয়োগ করে শব্দের প্রকাশক্ষমতা বাড়ালেন। কিন্তু সেইসঙ্গে সাহিত্যের ভোজে প্রকারান্তরে পঙ্‌ক্তিভেদ এনে দিলেন।
প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ভৌগোলিক সীমানা কেবড় করে মানবিক আবেগকে আরও বেশি পার্থিব করা হল।
বুদ্ধদেব বসু মানবদেহের বন্দনা গাইলেন। কবিতারসৃজনমূলক সামালোচনার ক্ষেত্রে এবং কবিতা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবেআধুনিক কবিতার ইতিহাসে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জীবনানন্দ কবিতাকে নিয়ে গেলেন বুদ্ধি থেকে বোধেরদিকে, যুক্তির শৃঙ্খলা থেকে বস্তুবিশ্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের মধ্যে। হৃদয় সঞ্চারিতহল প্রাণহীন জগতে। কবিতা পেল স্বতোৎসারিত নির্ঝারের গতিপ্রকৃতি। হৃদয়বান কবিতার যুগ অতিক্রান্ত বলে যারা ভয়পেয়েছিল, নতুন করে তারা ভরসা পেল জীবনানন্দের অনুভূতিনির্ভরকবিতায়। শব্দের সামনে সমস্ত অর্গল মুক্ত হল।

সমর সেন সৃষ্টিশীলতায় স্বল্পায়ু হলেও একনতুন দিকে বাংলা কবিতার মুখ ফিরিয়েছেন। স্বচ্ছন্দে কথা বলার মত করে সহজসাবলীলতায় বাংলা কবিতাকে তিনি যে চলার পথের সন্ধান দিয়েছেন, পরে নতুনঅভিয়ানের ভেতর দিয়ে সেই পথ দিকে দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে।

নতুন আশার পথ ধরেই শু হয়েছিল অণ মিত্রের যাত্রা---কথা বলার ভাষাকে কুচাকাওয়াজের মত সাজিয়ে। কিন্তু শুধু চূড়ান্তজয় নয়. সে পথে অনেক আশাভঙ্গ, খন্ডযুদ্ধে অনেক পরাজয়ও আছে। বাস্তবেরচোখে চোখে রেখে অণ মিত্র কখনও চিন্তিত, কখনও প্রসন্ন।

এমনি করে বাংলা কবিতা বিংশ শতাব্দীর শেঘ পাদে এসেপৌঁছেছে। কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে বলে যে নৈরাশ্যবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণীকরেছিল, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তারা ভ্রান্ত।

বাংলা কবিতার এই মিছিলে যারা আমাদেরও অনেকপরে এসেছে তারা এই পরস্পরার কথা নিশ্চয় মনে রাখবে।
কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সৃষ্টির রাজ্যেকাউকে সেলাম ঠোকাটা রেওয়াজ নয়। ছোট-বড়র সম্পর্কটা সৃষ্টিরক্ষেত্রে অচল। ঐতিহ্যের ব্যাপারটা আত্মস্থ করার জিনিস,প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান করে তো হয় না।স্রষ্টার পক্ষেদরকার বিনয় নয়--- আত্মবিশ্বাস। সঙ্কোচ নয় --- স্পর্ধা।

মায়াকভস্কি সম্বন্ধেএকাট লেখায় পড়েছিলামঃএকবার এক সভায় তিনি কবিতা পড়বেন। মঞ্চের ওপর থেকে কবিতা পড়া হবে,তার পাশেই উঁচু করে বসানো ছিল পুশকিনের একটি আবক্ষ মূর্তি।কবিতা পড়াবার ঠিক আগে মায়াকভস্কি সেই মূর্তিটাকে ধরে মঞ্চেরপাটাতনে নামিয়ে রাখলেন এবং বললেন, পুশকিন আমার প্রণম্য --- কিন্তুআমি যখন কবিতা পড়ছি, তখন আমার চেয়ে আর কাউকেই আমি বড় বলে মানিনা। তারপর কবিতা পড়া শেষ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুশকিনের সেই মূর্তিউঁচু জায়গায় রেখে দিলেন।

একজন কবি মানে এ নয় যে, কবিদের দুর্বিনীত হতেহবে। অথবা যাঁরা নমস্য, তাঁদের অশ্রদ্ধা করতে হবে। আসলে আমি বলতে চেয়েছিসৃষ্টির সেই অনুপ্রাণিত মুহূর্তের কথা--- যখন ইতিপূর্বে মহৎ যাকিছু লেখা হয়েছে, তার সবটাই কবির অন্তর্গত উপাদানের মধ্যেমিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, নতুন সৃষ্টির আয়োজনে কবি যখন যজ্ঞকর্তা।
রবীন্দ্রোত্তর কবিতার পর্বে যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি এবং যার জের আজও চলেছে --- এনন দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমিআমার এই ছোট মুখে বড় কথা শেষ করবে।

এই পর্বের একেবারে গোড়ার দিকে কবিতাকেসাপ্টাভাবে বলা হত পদ্য এবং আলাদা করে বলা হল গদ্য কবিতা। গদ্যকবিতাকে আরও যা বলা হত, সে আর আমি বলছি না। এখন একমাত্র শক্তিচট্টোপাদ্যায় ছাড়া আর কাউকে বড় পদ্য বলতে শুনি না। গদ্য কবিতা এখনকবিতা মোটের ওপর গ্রাহ্য হয়ে গেছে।

এটা খুব সহজে হয় নি। প্রথম গীতাঞ্জলির ইংরিজিঅনুবাদে এ ধারা রবীন্দ্রনাথই শু করেন। তারপর পুনশ্চ লেখবার পরেও এরপ্রচলন নিয়ে মনে মনে তাঁর রীতিমত সংশয় ছিল। তাঁর উৎসাহ সত্ত্বেও খুবকম কবিই সে সময়ে গদ্যে কবিতা লেখার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। গদ্য কবিতাকেবাংলা সাহিত্যে একার চেষ্টায় যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত করেথাকেন, ত াহলে তা করেছেন এর অনেক পরে সমর সেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার যেগদ্য, তা একেবারে পদ্যেরছোঁয়াচমুক্ত নয়। ব াংলায় প্রথম সমর সেনইকবিতাকে কথা বলার ঢঙের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর লেখারএকেবারে শেষ পর্যায়ে সমর সেন ক্রমশ গদ্য থেকে প্রায় পয়ারের দিকেঝুঁকেছিলেন। বরং গদ্যের পথকে আজও কবিতায় প্রায় একমাত্র অবলম্বন করে সমর সেনের চেয়েওঅটুটভাবে এবং যথোচিতভাবে লিখে চলেছেন অণ মিত্র।
গত প্রায় পঁচিশ বছরে কবিতা আস্তেআস্তে আবার পদ্যের ঝোঁকে ফিরে এসেছে। এটা শুধু জীবনানন্দেরক্রমবর্ধিতপ্রভাবের ফলে, কিংবা বিষ্ণু দের অবিরাম ছন্দচর্যার ফলেই ঘটেছে--- আমি তা মনে করি না। এরপেছনে সমকালীন জীবনের মূলগত কোনো কারণ আছে। যন্ত্রবিদ্যায় আর বিজ্ঞানেসম্প্রতিকালে যে বিপ্লব চলেছে, তার স্পন্দমান আবেগ, অজ্ঞাতে কোনোভাবেএকালের কবিদের সংক্রামিত করেছে কি ? আমি জানি না।

এই প্রসঙ্গে আমার কম বয়সের একটি গল্প নাবলে পারছি না। আমি তখন আই-এ ক্লাসের ছাত্র। সমর সেনের সঙ্গেআম ার আলাপহয়েছে। কামাক্ষীপ্রসাদ দেবীপ্রসাদের ফ্ল্যাটের ছাদে আমারপদাতিক কবিতার প্রথম খসড়া পড়ে শোনানোর পর সমর সেন বলেছিলেন ঃএকেবারে শেষের অংশটি তুমি গদ্যে লিখেছ কেন ? সর্বশেষে সাম্যবাদে তো ছন্দের আব ারনবজন্ম হবে ! তখনও আমি কডওয়েল পড়ি নি।

কিন্তু শঙ্খ ঘোষ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, এমন কিঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাকেও নিছক পদ্যে প্রত্যাবর্তন বলা যায় কি ? শঙ্খ ঘোষের কবিতায়তো গদ্যপদ্যের মধ্যেকার সীমারেখা প্রায় লুপ্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ওকিছুদিন সাধু ক্রিয়া আর অব্যয়ে বাসা বাঁধার পর এখন পুরোপুরিভবে চলতিকথা বলার ছাঁদে স্বচ্ছন্দে ফিরে এসেছেন।

মধ্যে এক সময়ে বাংলা কবিতায় রাজনীতির বাযুগচেতনার ছাপ খুব উচ্চকণ্ঠে অথবাস্পষ্ট ধরা পড়ত। এখন তা ব্যাপকও নয়, প্রবল নয় এখনকার কবিতাততটা বিষয়প্রধান না, যতটা বিষয়ীপ্রধান। এটা সাধারণ চিত্র।ব্যাক্তিগতক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে চোখে ঠেকেজাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধেনবীন প্রবীণ নির্বিশেষে কবিদের মমত্ববে াধের অভাব।এমনও আন্দোলন গেল, বাংলা কবিতায় তার ছাপ প্রায় পড়েনি বললেইচলে।বাঙালীর মনে ভারতের স্ব াধীনতায় প্রাপ্তির চেয়ে হারানোর বোধপ্রবলতর। যে কবিরা এক সময় প্রগতির আন্দোলনের মুখর ছিলেন,তাঁরা এখন অনেকে হয় চুপচাপ, নয় আত্মসন্ধানী। এই প্রসঙ্গে আধুনিকবাংলা কবিতার বিগত অর্ধশতাব্দীতে লক্ষিত দুটি ঘটনায় বিশেষজ্ঞ আরসমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি দিতে বলি।
প্রথমত, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় দেশাত্মবোধেরপ্রকাশ রীতিমত কুণ্ঠিত কেন ? গানকে আমি কবিতা থেকে বাদ দিচ্ছি। প্রকৃতি প্রেমের বাশৌর্যবীর্যের কবিতাও আমি ধরছি না। আমি বলছি এমন মন - কেমন -করা কবিতারকথা, যার কেন্দ্রে আছে দেশকে ভালোবাসা। আমাদের জাতীয় আন্দোলনেরপ্রকৃতির মধ্যেই কি এর কোনো কারণনিহিত আছে ? এক নজল ছাড়া, কোনোনামী কবিই না ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা, ন হয়েছেন ইংরেজের হাতেলাঞ্ছিত। এমন কি নজলের সংগ্রামী ভুমিকাও তেমন ধারাবাহিক বাদীর্ঘস্থায়ী নয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেশিল্পসাহিত্যের আত্মিক সম্পর্কহীনতা। এই দুইয়ের সাযুজ্য মাঝেমধ্যে যখনঘটেছে, তখনও তা বিশেষ ঘটনাসূত্রে এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে। কলম ছেড়েরাজনীতি করা অথবা রাজনীতি ছেড়েকলম ধরা ----সাধারণভাবে এটাই কিএ-পর্বের রেওয়াজ নয় ?

একালের কবিতারদুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গটা অন্তত ছুঁয়ে না গেলে অনেকেই হয়ত আমারওপর নারাজ হবেন।আধুনিককবিতার বিদ্ধে যাঁদের দুর্বোধ্যতার নালিশ এবংরবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁদের কাছে দুর্বোধ্য নয়, তাঁদের বিবেচনার্থে আগে এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েটি কথা পেশ করে রাখছি ঃপ্রকৃতির নিয়মঅনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট। সম্পাদক এবংসমালাচকেরা তাহার বিদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহারব্যতিত্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমনকাব্যেও তেমনি--- দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট , বেগ অস্পষ্ট, অচলতাস্পষ্ট, মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তইস্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতেপারে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্টএবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না,তাঁহারা কাব্যরসের প্রতিমনোযোগ করেন।

এ নিয়ে আমি আপাতত এর বেশি বাগ্‌বিস্তার করতে চাই না। শুধু এর সঙ্গেসামান্য একটু নিজের কথা যোগ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ স্থানের বিচারেবলেছেন, দূর অস্পষ্ট নিকটস্পষ্ট। আমি কালের বিচারে এটাকেই একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলতে চাই,দূর স্পষ্ট, নিকট অস্পষ্ট। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের গোড়ার যুগের সঙ্গেআজকের যুগকে মেলালেবর্তমান এবং অনাগত পাঠকদের সম্পর্কে বুক ঠুকে এ কথাবলা যায়।
এ লেখায় আমি যাঁদের নাম করেছি, তাঁরা নমুনামাত্র --- তাঁরাই সব নন। এটা জানিয়ে রাখছি কারো ভয়ে নয়। সত্যেরখাতিরে।

(অপ্রকাশিতরচনা)

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com